মূর্ত বিমূর্ত কথা

হিরণ মিত্র

১

পঞ্চাশের শেষে, ছোট্ট এক চিলতে টিন ঢাকা বারান্দায় একটা দড়ির দোলায়, জামবাটিতে মুড়ি মেখে, দুলতে দুলতে যোগেনদা এক মনে কী ভেবে যায়। খড়গপুর শহরে, হরভূষণমালের বাড়ী, গরমের ছুটিতে আশেপাশে এঁকে বেড়ানো চল, হাতাওয়ালা গেঞ্জীগায়ে, ধুতি লুঙ্গির মতো জড়ানো সরুকোমরে। কাঁধ বুক পেট ঝুঁকে আছে, ক্ষীণকায়। উজ্জল চোখ। হাল্কা দাড়ির আভাষ। মাঠপ্রান্তর, সাঁওতাল গ্রাম, পুরুষ রমণী ছেলের দল উঠে আসছে ওঁর তুলিতে। কখনো বেড়ার কঞ্চি ভেঙ্গে কালিতে ডুবিয়ে কমনীয় রেখা বয়ে যায়। একটা অদ্ভুত খয়েরী আর হলুদ ছিল যোগেনদার প্যালেটে। কাটা ধানের ক্ষেত, সোনালী জমিন অন্য এক ছবি হ'য়ে উঠতো। কখনো দেখেছি সন্ধ্যের আঁধারে টান টান বিছানায় আধশোয়া। ভয় পেতাম। নিস্তব্ধতা ভাঙতে। এত ডুবে থাকতেন ছবিতে। তাকালে তাই মনে হতো। পাশে পাশে ঘুর ঘুর করতাম যদি রঙ চুঁয়ে পড়ে। তারপর একসময় শীত এলো। আবারও উঠোনে উঠোনে ঘোরা। শীতের কুয়াশায় মুরগী মোরগের আনাগোনা। ওঁর প্রিয় বিষয়, হাল্কা খয়েরী কাগজে রঙ ঘন হয়ে উঠতো, বহুকাল অমন হাল্কা খয়েরী আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলো। জ্যোতিবসুর প্রতিকৃতি আমাদের বাড়ীতেই আঁকেন। প্রতিকৃতি আঁকতে ভীষণ ভালবাসতেন। যোগেনদার পরতে পরতে দৃশ্যভাষাকে রাঙিয়ে তোলার একটা প্রবণতা ছিল। তার প্রভাব আমাদের উপরেও পড়ে। আমাদের ছবিতে তখনও তেমন রূপ নির্মিত না হলেও, যে ঘোর সে এনেছিলো, কাগজজুড়ে তার রেশ আজও কাটেনি। বালি কাগজে, কালি, রঙ, নিব, তুলি ওঁর স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতো। ষাটের শুরুতে আকাদেমীর সেন্ট্রাল গ্যালারীতে ওর অনেক ছবি আমরা তখন দেখেছিলাম।

খুব ছোট বয়স থেকে মানুষ দেখতে খুব ভালবাসতাম। হাড়ের খাঁজে খাঁজে আলো ছুয়ে যাওয়া। বলি রেখা, মসৃণ পিঠে আলো গড়িয়ে পড়া। এমন দেখার সাথে ওঁর ছবি জুড়ে যেতো। অনেক পরে বিড়লা আকাদেমীতে বা সিমা গ্যালারীতে দেখা টানা চোখের মাঝ বয়সী মেয়েদের রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখেছি। গ্যালারী থেকে বেরিয়ে ভীষণ চেনা লাগছে অচেনা পুরুষ রমণীদের। কোথায় যেন দেখেছি। লেক মার্কেটের পাশে সেই সন্ধ্যেতে এক মহিলার প্রোফাইল আজও চোখে ভাসে, এত চেনা কেন? ভুল ভাঙ্গে সিমা গ্যালারীতে যোগেনদার আঁকা প্রোফাইল দেখে। এমন আর কারও ছবিতে পাইনি।

বিশেষ ধরনের চোখ, নাকের টিকোলো ভাব, কপাল, চিবুক, গলা, পট নয়, পটে আঁকা নয়, তবুও একটা অলঙ্কার আছে। ফুলেতে, লতায়, পাতায়, নক্সায় শাড়ীর ভাঁজে, পাহাড়ের খাঁজে ওর মোটাতুলি আঁচড়িয়ে যায়। শাড়ীর, কাপড়ের অজস্র ভাঁজ চামড়ার মতো পরতে পরতে পড়ে থাকে। কখনও রেখা তীব্র চিরে চিরে যায় কাগজের শরীর। যে জাল সে বুনে তোলে, হাল্কা রঙের আভাষ লুকিয়ে রাখে, তা সম্মোহিত করে।

২

নিজে একজন সামান্য ছবি আঁকিয়ে হিশেবে, অগ্রজ শিল্পীর দৃশ্য ভাষাকে দৃশ্য করে তোলা বেশ দুরূহ কাজ। একটা দীর্ঘসূত্রতার সুবাদে, একটা আবেগের তাড়নায়, আজও দৃশ্য-স্মৃতি কাজ করে যায়। আমার চিত্র নির্মিত হয় না। অ-নির্মিত হয়। তাই নির্মিত ছবির ঘরাণায়, দক্ষতায়, আমার স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও অভিজ্ঞতা হিশেবে আমি ভীষণ কৌতুহলী। একটা ঘটনা যেন শায়িত আছে সামনের আঙ্গিনায়। আমি তাকে স্পর্শ করতে পারি। এ আগ্রহ আমাকে বার বার টেনে নিয়ে যায়। তার যাদু ক্রিয়ায়। প্রকরণ, পদ্ধতি,রূপ, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিমূর্ত অথবা মূর্ত রূপ, প্রকরণ বা উপকরণ খুঁজে নেয়। সাথে এসে মেশে পদ্ধতি। পদ্ধতিতে থাকে রূপ-আবিস্কার।

আমার ছবি যে ভাবে নির্দেশিত হয় অথবা নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তাতে দর্শকের অস্বস্তি বাড়তি এসে জমা

হয়। অ-নির্মিত চিত্র সাধারণভাবে চিত্রের আখ্যা পায় না। তাই যত বিতর্ক। বহুশিল্পীর চিত্র-রচনার দায় আছে। আমি হয়ত সেখানে মুক্ত। স্বাধীনতা বা মুক্তি শিল্পী ও দর্শকের, দুজনের কাছেই বিপদজনক। কারণ এই মুক্তিকে নিরীক্ষণ করা: মুক্তিকে আত্মস্থ করা, মুক্তিকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব কাজ। আমরা নেশাসক্ত হই আমাদের মধ্যে জমে থাকা, তলিয়ে যাওয়া আবেগে, সুপ্ত বোধে। এই সব কিছুর পর্দা সরিয়ে দেওয়ার জন্য। চিত্র-রচনাও আমাদের নেশাসক্ত করে। সেও পর্দা সরায়, বিপদ এখানেই।

যে তাড়না, আত্মআবিষ্কার, যে স্বত্তা, চিত্ররচনায় প্ররোচিত করে, সেই প্ররোচনায় দর্শক এসে সামিল হয়। তাতে ন্যারেটিভের একটা ভূমিকা থাকে। আবার ন্যারেটিভ বারবার রূপ বদলায়। তাতে শুরু শেষ ও মধ্য লয়ে তাল সৃষ্টি করে। কখনও তাতে থাকে কাহিনীর জটিল বুনোট। পুরুষ রমণীর সম্পর্ক। সমস্তই অবয়বে। বিমূর্ততাই এখানে অস্বস্তি আনে। কারণ বিমূর্ততায় একটা আরোপের প্রয়োজন পড়ে। দর্শকের মনের আরোপ। তখনই তার অনীহা জন্মায়। অর্থহীন মনে হতে পারে তার এই চলন। তবুও অবয়বে যে বিমূর্ততা প্রচ্ছন্নে থাকে, তাকেও আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়। তার ভাব, আবেগ, কথকতা, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যেতে পারে।এইখানে 'আইকন' হয়ে ওঠার জন্য তার মধ্যে যে আগ্রহ তাই তার চালিকা শক্তি। আপাত: অবয়বহীনতারও জেন্ডার আছে। তারও পুরুষ ও রমণী ক্রিয়া আছে। সাযুজ্য এই সংশয়কে, এই জটিলতাকে সহজেই এড়াতে পারে। তখনও তার বিমূর্ততার কাহিনী অন্যখাতে বয়। আইকনের যে পাওয়ার সেন্টার তার যে অমোঘ উপস্থিতি, যে বেদীতে সে স্থাপিত, তার যে ছটা, সবেরই অনুরণন সমাজে, দেশে, বহুদূর বিস্তৃত হয়। তাতেই তার খ্যাতি। তাকে স্বীকার করা বা না করার উপর সে নির্ভরশীল নয়। শিল্পী যেমন চিত্র নির্মাণ করেন, চিত্রও শিল্পীকে তেমন নির্মাণ করে।

দীর্ঘ চিত্র চর্চায় তাই আমার বিড়ম্বনাই জোটে বেশী। উপেক্ষাও। শুধুমাত্র কৌতুহল, অপার কৌতুহলই জিইয়ে রাখে আমার মধ্যে প্রাণ ভোমরা।

ছোটবেলার স্মৃতি, মেদুর, তারপর বয়স পাল্টায়, সময় পাল্টায়, চেনাজানা পাল্টায়, ছবির সাথে সম্পর্ক পাল্টায়, একাকী হই, শ্মশান সাধনার ঘোর লাগে মনে দেহে। ভাষায় ছবি হয়, ছবির ভাষা হয়। কোনটা মৌলিক রেখা, কোন রেখায় শিল্পী স্বাভাবিক পরিচিত হয়ে যায়, তাতে প্রশ্ন জাগে শিল্পী কি নিজেকে অনুকরণ করে। অথবা স্মৃতি-তাড়িত রেখা তার স্বাভাবিকতার মধ্যে বারবার অস্বাভাবিক আচরণ করে যায়। এই টানা পোড়েন কোথাও প্রকট; কোথাও বুনোটের আড়ালে রয়ে যায়।

" আমার মনে হয় আমার কাজে ক্রমে মৌলিকতা আসছে। প্রতিমাগুলো আমার এত চেনা এবং এও সত্য। তারা মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা অর্গানিক, অন্তর্মুখী এবং বিষণ্ণ। সময় সময় ব্যঙ্গ প্রবণ। আমি অনুভব করতে পারছি তারা অনন্য এবং আমার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে" (১)

৩

মূর্ত বিমূর্ত কথাটার মধ্যে একটা ধন্দ আছে। জায়গা বদলের ধন্দ। সবরূপেরই একটা বাহির ও ভিতর আছে। আপাত অবয়বহীনতার যে অবয়ব, তার অবয়ব বা সাযুজ্যের ভিতর যে বিমূর্ততা তা অনুভবের জগৎ। বার বার তাকিয়ে থাকতে থাকতে রূপ নির্মিত হয়। আমি যখন তাকে প্রতিষ্ঠা করি তখন তাতে থাকে সাধারণ সাযুজ্য ও সাযুজ্যহীনতার ব্যাখ্যা কিন্তু সত্যিই কি তা থাকে? অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, অনুভূতি রূপ নির্মাণে অথবা বি-নির্মাণে ক্রমশই ঘনীভূত হয়। গ্রহণ বা বর্জন তাই মুখ্য নয়। কোন অবস্থানও তাই মুখ্য নয়। জার্নি উইথ দ্য সার্কেল বা এ্যালঙ দ্যা সার্কেল। অবস্থান পাল্টিয়ে চলে।

ভিতর থেকে উঠে আসা ছবি, শিল্পীর স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে। স্বীকার করার মধ্যে এক ভঙ্গি থাকে। যেমন ছবিরও

একটা ভঙ্গি আছে। নিজের সাথে থাকতে থাকতে নিজের চেহারা আর ছবির চেহারা কেমন এক হয়ে যেতে থাকে। আক্ষরিক অর্থে নয়, রূপ অর্থে।

৪

প্যারিস রওনা হবার আগের রাত্রে সরকারী আর্ট কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল যোগেনদার সাথে, কথাগুলো তেমন মনে নেই। কিন্তু একটা দ্বিধা দেখেছিলাম সেই সময়। আমাদেরও বিদেশ সম্বন্ধে কৌতুহল ছিল। অনেক বিদেশী বন্ধুও জুটেছিল, ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই ভাবতাম। এত টানাটানি চলত, ভাবতাম যদি একটা হিল্লে হয়। না তেমন কিছুই আমাদের হয়নি। ছবি নিয়ে সমাজের সাথে কথাবার্তা তেমন গড়ে ওঠেনি। ফরাসী শিখছিলাম, বুকে আশা নিয়ে। অল্পকিছুদিনের মধ্যেই সব ভুলই ভাঙ্গল। এর বহু পরে বছর চব্বিশ পরে প্রথম বিদেশ যাই। তাও ভিন্ন কারণে, ভিন্ন পরিবেশে। যোগেনদা ফিরে আসার পরও অনেক কথা হয়েছে। প্যারিসের ছবি দেখা নিয়ে। আমাদের মননে পাশ্চাত্য যে প্রচ্ছন্নে আছে তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। তারপরও অনেক কথা থেকে যায়। করারও থেকে যায় অনেক। ছবিতে আমাদের জল হাওয়া রোদ এসে পড়ে।

" আমাদের ছবিগুলো তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে, যখন বলতে পারা যাবে, এর আগে কখনোই এরকম আঁকা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও এরকম আঁকা সম্ভব হবে না, কাজটিতে এভাবেই বিধৃত থাকবে সময় এবং নিজস্ব চরিত্র।" (২)

ছবিতে সময় কিভাবে ধরা থাকে অথবা সময় চিহ্নকে বুঝতে তার লক্ষণকে বুঝতে আমাদের কাছে কী ধরনের ভাবনা কাজ করে যায়? নতুন কিছু করার, ভিন্ন কিছু করার ঝোঁক একটা সাধারণ ঝোঁক, জনপ্রিয় ঝোঁক। কিন্তু ভিন্ন বা নতুনকে চিহ্নিত করা সহজ কাজ নয়। নিজের স্বাভাবিক ছন্দকে কারও কাছে অনন্য মনে হতে পারে। কিন্তু একই সাথে স্বাভাবিক ও অনন্য এমনটা হয় না। এটি মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ নয়। অনন্যকে নিজের স্বাভাবিকত্বে চিনে নেওয়ার জন্য বা একাত্ম হওয়ার জন্য দীর্ঘ অনুশীলন লাগে। যা আজকে বিরল। রেখা আপন ছন্দে বেড়ে উঠেছে। শিল্পী তাকে নিরীক্ষণ করছে এমনটাই হয়। তা নতুন কি ভিন্ন এ প্রশ্ন শিল্পীর কাছে গৌণ থেকে যায়।

" একজন সত্যিকারের শিল্পী মূলত: কী চান? তিনি চান আন্তরিকভাবে সার্থক চিত্রকলা সৃষ্টি করতে।" (৩)

চিত্রে সার্থকতা কোথায় বা সার্থক চিত্রকলা কি ভাবে বুঝে ওঠা যাবে এমন ধারণা আমার নেই। একটা গঠন প্রক্রিয়ায় আমি অংশ নিই। অংশ নিতে নিতে একসময় তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাই, অন্য কোন গঠনে। কে আমাকে পরিত্যাগ করতে বলে বা কেনই বা অন্য কোন গঠনে চলে যাই, তাতে অতৃপ্তি কাজ করে না, অনাস্বাদিত তৃপ্তিই এনার্জাইজ করে, তারই উত্তেজনায় ক্যানভাসের পর ক্যানভাস ভরিয়ে দিতে ভাল লাগে।

এভাবেই চলছে মূর্ত বিমূর্ত কথা।

(১), (২), (৩) অরুণ সেনের লেখা
'যোগেন চৌধুরীর ছবি' বইটি থেকে।